জেসমিনের বসন্ত

মেকাইল রহমান

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মনের মানুষ	৫
নীলমণিকাব্য	১৫
আনুচাচি	২৪
বিশ্বের বাজার	৩২
সাইকেল	৪২
মাহিনা	৫২
কবিরাজ	৬২
আগুটান পিছুটান	৭২
ভোটদাতা	৮৫
হবু হাজি	৯৫
ঘরবাড়ি	১০৬
ফাঁপর	১১৯
চতুর আলির হাত	১২৭
কাঁকড়ার ঝাল	১৩৬
জেসমিনের বসন্ত	১৪৮

মনের মানুষ

১.

চিত্তব্রত চৌধুরি বললেন — নাহ্, মনটাকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না! বারবার ভাবি, কিছুতেই আর হারব না মনের কাছে, তবু বারবার হেরে ভূত হয়ে যাই। এ এক দুর্নিবার পরাজয়!

কেউ কি শুনল?

না! পরাজয়ের গ্লানি থেকে বেরিয়ে আসা চিত্তব্রতবাবুর এই খেদোচ্ছ্বাস আজ আর মালতীদেবীকেও ভাবায় না।

সকালের বাতাস বইছে খুশিমতো। কোনো বাধার সে পরোয়া করে না। আকাশের অসীম বিস্তারে আপন খেয়ালে ভেসে বেড়াচ্ছে উচ্ছল মেঘপুঞ্জ। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কেউ তো তাকে পেছনে টানে না তার স্বতঃসঞ্চারের ঝুটি ধরে। পাখিরা গাইতে গাইতে উড়ে যায় মনের আনন্দে। ইচ্ছে মতো তাদের পরিযান। আপস করতে হয় কি এদের? বাইরের চাপ পড়ে কি এদের খেয়ালখুশির ওপরে? এদেরও কি সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় নিত্য?

বাইরে চোখ রেখে চিত্তব্রত মনে মনে আকাশ-বাতাস আর পাখিদের কথা ভাবেন। তাদের অস্তিত্বের শর্ত-পরিস্থিতি ঘিরে কত সন্দেহ-কৌতূহল জাগে জিজ্ঞাসার আকারে তাঁর মনে। এক চরম অস্বস্তির তাড়নায় অস্থির হন তিনি।

মালতীদেবী চা দিয়ে গেলেন নীরবে।

মনের যন্ত্রণার কথা কাছে ডেকে সরাসরি না জানালে, মালতীও আর উড়োকথায় সাড়া দেন না। বিবাহিত জীবনের আটাশটি বছর তাঁর সুখের অসুখ নিয়েই কাটাতে হল। একটা দিনও যদি মানুষের মন ভালো যায়! একটা দিনের জন্যেও কি চিত্তব্রতর মনের ভেতরের অতৃপ্ত অসুখী মানুষটির সুখতৃপ্তি মেলে না কিছুতেই? সমস্ত কিছুই আছে, অথচ কিছুই যেন নেই! দেহেমনে ভাজাভাজা হয়ে আছেন মালতী মনপাগলা মানুষটিকে নিয়ে। রাগ করে দুটো কড়া কথা বলা যেমন তাঁর ধাতে সয় না, তেমনি প্রতিদিন একশোবার করে এক কথা বলে বলে মন বোঝানো ও মন ভোলানোর ধৈর্যও তাঁর নেই আর। একমাত্র সন্তান দেবব্রতটা বাইরে। তার চিন্তাতেই সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাঁর মন। ছেলেটার জন্যে মাঝে মাঝে মনটাও খারাপ হয়। মনমরা হয়ে থাকেন তিনি। তখন মনের সান্ত্বনা দিতেও দুটো কথা পারতপক্ষে বলেন না চিত্তব্রতবাবু। মালতীদেবী ভেবেছিলেন,ছেলেটা বিদেশবিভুঁইয়ে থাকলেও, স্বামী কাছে আছে, সুখেদুঃখে দুজন দুজনের হয়ে কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু তাঁর এই ভাবনাটাই ভুল। স্বামী তাঁর নিজের মনটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত,

পরের মনের খোঁজ নিতে তাঁর বয়েই গেছে। মালতীদেবী তাই চিত্তবাবুকেও ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর নিজের মনের মর্জির ওপরেই।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে চিত্তবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন।

মালতীদেবী এক ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি চাইলেন, যদি সত্যিই প্রয়োজনীয় কিছু কথা থাকে বলবার, তবে আরও একবার ডাকতে হবে, ডাকুক আর একবার।

— কই গো মালতী! তুমি কি শুনতে পাও না আমার ডাক?

চিত্তব্রত চৌধুরি সকালের চা-পানের কথা বিলকুল ভুলে যেন গভীর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা মন খুলে এক্ষুনি বলতে চান মালতীদেবীকে, এমনই ব্যস্তসমস্তভাবে তিনি ডাকলেন।

মালতীদেবী এসে দেখলেন পেয়ালায় ঠান্ডা হচ্ছে গরম চা।

—কী ব্যাপার, তুমি চা খেলে না?

এই জিজ্ঞাসার মধ্যে এমন একটা সুর ফুটে উঠল যে তাতে চিত্তবাবু ভাবলেন, মালতী বুঝি বলতে চাইছে যে তিনি ইচ্ছে করেই চা-টা খেলেন না, যেন হেলায় ঠান্ডা হতে দিচ্ছেন তিনি এক পেয়ালা গরম চা। এমনটা ভাবতেই তাঁর মনে হল—বাহ্, এই তো একটা বিরাট বিষয় তাঁর জীবনের, এই চা-পানের ব্যাপারটা নিয়েই তো অনেক কথা এখনও বলা যায় মালতীকে।

তিনি বললেন— আচ্ছা মালতী, এই চা-পানের অভ্যেসটা গড়ে তোলা আমার জীবনে আদৌ কি ভালো হয়েছে?

মালতীদেবী বললেন, চা-পানের মধ্যে আবার জীবনের ভালো-মন্দ কী দেখছ তুমি? চাষালোক পান্তাভাত খায় আর ভদ্রলোক চা-পান করে। অভ্যেসটা খারাপ কী?

চিত্তব্রত বললেন, তোমার কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার মন তা মানে না। ছোটোবেলা থেকে আমার অভ্যেস ছিল সকালবেলা জলখাবার হিসাবে শুকনো মুড়ি ও আখের গুড় খেয়ে দু-গেলাস জলপান করা। আজও মনের মধ্যে রয়ে গেছে পুরোনো সেই অভ্যেসের টান। চা-টা মন থেকে আমি চাই না।

মালতীদেবী বললেন, তাহলে তো না খেলেই পার।

—দেখেছ তো, শুধু শুধু তুমি রাগ করছ আমার ওপর!

—না না! এতে রাগারাগির কী আছে? খেতে ভালো না লাগলে খাওয়ার কী দরকার? তুমি তো আর ছোটো শিশুটি নও। দ্যাখো, আটাশ বছর ধরে তুমি চা পান করছ। বহুদিন আগেই এটা তোমার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু যদি তুমি বল, চা-টা মন থেকে আমি চাই না, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।

—রাগ কোরো না, মালতী। আমার মনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। চা-পান করাটা এখন আমার অভ্যেস, এটা যেমন ঠিক, তেমনি চা-পান করতে আমার মন চায় না, এটাও ঠিক। এই কথাটা আমি বলতে চাইছি।

—আচ্ছা বেশ।

—এই সঙ্গে আর একটা কথাও আমি বলতে চাইছি, মালতী। আশা করি সেটা তুমি বুঝতেও পারছ।

—কী?

—তোমার বাবাই আমাকে প্রথম বলেন, চা হল ভদ্রলোকের পানীয়। চা-পানে দোষ নেই। মনে আছে তোমার?

—হ্যাঁ। তাই কী?

—মানে, বুঝতেই পারছ তোমার বাবার প্রভাবে আমার চায়ের অভ্যেস। অভ্যেসটা ভালো কী মন্দ, তার চেয়ে বড়ো কথা, অভ্যেসটা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে আমার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। এ তো একটা অভ্যেসের কথা বললুম। এমন অনেক অভ্যেসই গড়ে উঠেছে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, যা আজ আমি চাইলেও আর রদ করা যায় না। এবং এতেই মরছে আমার মনের ভেতরের মানুষটা!

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসে চিত্তবাবুর ভাবমূর্তি পৌঁছে গেল আধিভৌতিক দার্শনিক জ্ঞানমার্গে। প্রতিটি কথা তাঁর মুখ থেকে যেন অতিরিক্ত জোর নিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে। ঠোঁট নড়ছে অন্তরের খাঁটি ভাব-অনুভবের উত্থান-পতনের তালে তালে। চোখ বুজে আসছে কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীর মতো। যন্ত্রণাদীর্ণ মনের মানুষটা মুহূর্তে মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর ভাবমূর্তির দিব্য অবয়বে।

চিত্তব্রতর এই রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলেন মালতী। অনেক দিন ধরেই তিনি চিত্তব্রতর মনের কথা শুনে আসছেন, মনের মানুষটার যন্ত্রণার কথা শুনে আসছেন। কিন্তু আজ তাঁর সমস্ত কথা এবং কথা বলার ভাবভঙ্গি মানুষের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে। মালতী আটাশ বছরের দাম্পত্যের সমূহ সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে এক করেও যেন কোনো থই পান না সেখানে।

ঠান্ডা চা-টা চার চুমুকে সাবাড় করে চিত্তব্রত বললেন, তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছ, মালতী?

মালতী কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, না।

— আমার আচরণে?

— না। তবে অবাক হচ্ছি। তুমি তো এমন ছিলে না!

— ছিলাম। আমি বরাবরই তো এমন। আসলে মনের ভেতরের তোলপাড়টা ইদানীং প্রবল হয়ে উঠছে। তার বহিঃপ্রকাশটাও তাই হয়তো অবাক করা। সত্যি বলছি মালতী, তুমি বিশ্বাস করো, মনটা বড়ো কষ্টে আছে আমার।

কেন? এ প্রশ্ন আর মালতীর করার দরকার হয় না।

২.

একই কথা ইদানীং বারবার করে বলছেন চিত্তব্রত চৌধুরি। বাবার মৃত্যু, মায়ের মৃত্যু, চাকরি পাওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে মোকামে জমি কিনে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে দু-তলা বাড়ি করা, দেবব্রতর লেখাপড়ার জন্য জীবনের আর সব ভুলে কঠিন প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে উন্মত্ত হওয়া, এবং এরপর দেবব্রতর স্টেটসে চলে যাওয়া, জীবনের প্রতিটি

প্রধান প্রধান বাঁকের কথা ঘুরে ফিরে বারবার এসে পড়ছে প্রতিটি কথায় প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিকভাবে।

চিত্তবাবু বলেন, পেছন ফিরে তাকালে এখন সামনে আর এক পা-ও আমার এগোতে ইচ্ছে করে না, মালতী।

মালতী শঙ্কিত হয়ে ভাবেন মাথার গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে না তো মানুষটার! সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, কেন অকারণে এমন উতলা হচ্ছ বলো তো তুমি?

— অকারণে নয়, মালতী। আমার উতলা হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

— বেশ তো, কারণ থাকে তো তার নিষ্পত্তি করো। যেটা করলে মনটা শান্তি পায় সেটাই করো।

— তাই ভাবছি। আর আমি মনের মানুষের কাছে হারব না। তুমি আমাকে সমর্থন করলে আর আমার কোনো বাধা নেই। তাহলে বলো, তুমি আমার পাশে আছ!

— এ আবার নতুন কথা কী? পাশে তো চিরদিন আছি। কিন্তু তোমার মনের মানুষটার ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলি কী?

— বলছি, বলছি!

উৎসাহ পেয়ে বেশ একটু রুখে দাঁড়াবার মতো একটা ভাব করলেন চিত্তব্রত। চিরদিন তিনি জানেন তাঁর যে ব্যবহারিক সত্তা নিত্য তাঁকে দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি করিয়ে করিয়ে নাজেহাল করে, তা তাঁর মন-মানুষটির বিবেকসত্তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অঢেল পাওনা প্রাপ্তির অতিতৃপ্ত অবস্থায় কিছুই যেন আর পেতে ইচ্ছে করে না তাঁর। বিশেষ করে, এত সবের কিছুই যখন কোনোদিনও তাঁর কাজে আসবে না আর, তখন কী দরকার এখনও এত পেয়ে? পৃথিবীর অন্য আর কারও মনের মানুষ এই মুহূর্তে এমন প্রশ্নে বিদ্ধ হচ্ছে কিনা তা চিত্তব্রত জানেন না, কিন্তু তিনি এখন কিছুতেই রেহাই পাচ্ছেন না এই প্রশ্নটার হাত থেকে।

আবেগবিস্ফারিত কণ্ঠে তিনি মালতীকে জিজ্ঞেস করেন— আচ্ছা মালতী, তুমি কি জান বর্তমানে কত মাইনে পাই আমি?

মালতী বললেন - কোনোদিন জানতাম না, আজও আমি জানি না। জানতেও চাই না।

চিত্তব্রত বললেন, তার মানে তোমারও চাহিদা নেই কোনো। অবশ্য কিছুরই তো অভাব নেই তোমার। অভাব না থাকলে চাহিদা আর কোথা থেকেই বা থাকবে।

তর্ক করতে চাইলে মালতীদেবী এখানে বলতে পারতেন, অভাব নেই, আবার আছেও। টাকাপয়সা আর গয়নাগাটি আর বিলাসবৈভবই জীবনের সব কি? মনের চাহিদা নেই? এই প্রশ্ন তুলে মালতীদেবী নিশ্চয়ই বলতে পারতেন যে, ছেলেটা বছরে একবারও আসে না, দু-বার তিনবার করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠায় কেবল মন ভুলিয়ে রাখতে, অত দূর থেকে সপ্তান্তে ফোন করে বলে, শরীরের যত্ন নাও। মনটা তখন দগ্ধ হয়ে যায়, মনের শান্তি তাহলে কোথায়?

কিন্তু না, মালতীদেবী নিজের মনোবেদনার কথা কিছুই বলতে চান না। চিত্তব্রতবাবু জানছেন একা তাঁরই মনের মধ্যে অন্য মানুষ আছে। তাই জানুন তিনি!

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান মালতী।

চিত্তব্রত বলেন, আমি এখন ঠিক করেছি উদ্দেশ্যহীনভাবে আর সঞ্চয় করব না। নিতান্ত যেটুকু দরকার দু-জনের দিনাতিপাতের জন্যে সেটুকু কেবল নেব, বাকি কিছুই আর নেব না। নিয়ে নিয়ে আর সঞ্চয় করে করে মনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। গ্রামের সম্পত্তির আয়, বাড়িভাড়ার টাকা, প্রতি মাসের গাদা গাদা মাইনে, সব আমি দিয়ে দেব। নাহলে কিছুতেই শান্তি পাব না আমি।

মালতী জিজ্ঞেস করেন, কাকে দেবে?

চিত্তব্রত বলেন, কত লোকই তো চায়। কারও অন্ন জুটছে না, এসে হাত পাতে। কারও বস্ত্রের অভাব, এসে দাবি জানায়। গরিবের ঘর ভেঙে পড়া, মেয়ের বিয়ে, অসুখবিসুখ, কত রকম সমস্যা! আর বিপদে কত লোক আসে সাহায্য চাইতে! তাদের দেব। অনেকে আছে—দারুণ অভাব, টাকার প্রয়োজন। কিন্তু মুখ ফুটে চাইতে পারে না, আমাদের চারপাশেই এমন অনেক মানুষ আছে। তাদের দেব।

মালতী বলেন, সে তো তুমি দাওই। কাউকেই তো ফেরাও না।

চিত্তব্রত বলেন, ওকে দেওয়া বলে না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার হাতে একশো টাকা ধরানো কিংবা ক্যান্সারাক্রান্ত গরিবের সাহায্যে পঞ্চাশ-একশো দেওয়া মানে দিতে হয় তাই দেওয়া। মনের মানুষের তাতে সায় থাকে না কোনো। এখন দেব সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে।

উদ্‌বিগ্ন হন মালতী, ভবিষ্যৎ?

চিত্তব্রত জানতে চায়, কার ভবিষ্যৎ?

— আমাদের ? দেবুর ভবিষ্যৎ? একমাত্র নাতি ডেভিডের ভবিষ্যৎ!

— আমাদের কারো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আছে কেবল অতীত আর বর্তমান। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভেবে সারা জীবন দু-হাতে আঁকড়ে কেবল সঞ্চয় বৃদ্ধি করেছি। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা ভাবিনি। আমাদের ভবিষ্যৎ তাই বর্তমানের মতোই পাকা। আর পাঁচ বছর পরে রিটায়ার করব। তারপর পেনশন পাব। তারপর কত বছর আর বাঁচব? সত্তর! আশি! তাতেও তো ফুরোবে না। সবই রেখে চলে যেতে হবে একদিন হঠাৎ। তখন আমার সঞ্চয় কে কী করবে, তা আর কিছুই জানতে পারব না আমি। তার চেয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে সব নিজ হাতে দিয়ে যাওয়াই ভালো।

চিত্তব্রতর কথার ভাব ভঙ্গি দেখে আঁতকে ওঠেন মালতী, কী বলছ এসব? শেষ বয়সে তোমার আমার টাকাই তো একমাত্র ভরসা! তা ছাড়া আজকাল কত মানুষের কত কঠিন কঠিন অসুখ হয়। সঞ্চয় না থাকলে মরে যাব তো! কে দেখবে আমাদের?

কঠিন গলায় চিত্তব্রত বলেন, কেউ দেখবে না। টাকা থাকলেও কেউ দেখবে না। টাকা না থাকলেও কেউ দেখবে না!